কুরআন অধ্যয়ন প্রতিযোগিতা ২০২৪
প্রস্তুতি সহায়ক তাফসীর নোট পর্বঃ ১৪

সূরা হাদীদ ১-১০ আয়াত

সূরা আল-হাদীদ কুরআনের ৫৭ তম সূরা, এর আয়াত ২৯ এবং রূকু সংখ্যা ৪। সূরা আল-হাদীদ মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে। হাদীদ অর্থ লোহা।

নামকরণ

সূরার ২৫ আয়াতের وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ বাক্যাংশ থেকে নাম গৃহীত হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

সর্ব সম্মত মতে এটি মদীনায় অবতীর্ণ সূরা। এ সূরার বিষয়বস্তু নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করলে মনে হয় সম্ভবত উহুদ যুদ্ধ ও হুদায়বিয়ার সন্ধির মধ্যবর্তী কোন এক সময় এ সূরা নাযিল হয়েছে। এটা সে সময়ের কথা যখন কাফেররা চারদিক থেকে ক্ষুদ্র এ ইসলামী রাষ্ট্রটিকে তাদের আক্রমণের লক্ষ্যস্থল বানিয়েছিল এবং ঈমানদারদের ক্ষুদ্র একটি দল অত্যন্ত সহায় সম্বলহীন অবস্থায় সমগ্র আরবের শক্তির মোকাবিলা করে যাচ্ছিলেন। এ পরিস্থিতিতে ইসলাম তার অনুসারীদের কাছে শুধু জীবনের কুরবানীই চাচ্ছিলো না বরং সম্পদের কুরবানীর প্রয়োজনীয়তাও একান্তভাবে উপলব্ধি করেছিলো। এ ধরনের কুরবানী পেশ করার জন্য এ সূরায় অত্যন্ত জোরালো আবেদন জানানো হয়েছে। সূরার ১০ আয়াত এ অনুমানকে আরো জোরালো করছে। এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ঈমানদারদের দলকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, যারা বিজয়ের পরে নিজেদের অর্থ সম্পদ খরচ করবে এবং আল্লাহর পথে লড়াই করবে তারা কখনো ঐসব লোকদের সমমর্যাদা সম্পন্ন হতে পারবে না যারা বিজয় লাভের পূর্বে জান ও মালের কুরবানী পেশ করবে। ইবনে মারদুইয়া কর্তৃক উদ্ধৃত হযরত আনাস (রা.) বর্ণিত হাদীস একথাই সমর্থন করে। তিনি أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংগে বলেন: কুরআন নাযিলের শুরু থেকে ১৭ বছর পর ঈমানদারদের আলোড়নকারী এ আয়াতটি নাযিল হয়। এ হিসেব অনুসারে ৪র্থ ও পঞ্চম হিজরী সনের মধ্যবর্তী সময়ই এ সূরার নাযিল হওয়ার সময়-কাল বলে নির্ধারিত হয়।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

এ সূরার আলোচ্য বিষয় হচ্ছে আল্লাহর পথে অর্থ-সম্পদ ব্যয় করার উপদেশ দান। যখন আরব জাহেলিয়াতের সাথে ইসলামের সিদ্ধান্তকর সংগ্রাম চলছিলো, ইসলামের ইতিহাসের সে সংকটকালে মুসলমানদেরকে বিশেষভাবে আর্থিক কুরবানীর জন্য প্রস্তুত করা এবং ঈমান যে শুধু মৌখিক স্বীকৃতি ও বাহ্যিক কিছু কাজকর্মের নাম নয় বরং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের জন্য একনিষ্ঠ হওয়াই তার মূল চেতনা ও প্রেরণা, একথা তাদের মনে বদ্ধমূল করে দেয়ার উদ্দেশ্যেই এ সূরা নাযিল করা হয়েছিল। যে ব্যক্তির মধ্যে এ চেতনা ও প্রেরণা অনুপস্থিত এবং আল্লাহ ও তাঁর দ্বীনের মোকাবিলায় নিজের প্রাণ, সম্পদ ও স্বার্থকে অধিকতর ভালবাসে তার ঈমানের দাবি অন্তসার শুন্য। আল্লাহর কাছে এ ধরনের ঈমানের কোন মূল্য ও মর্যাদা নেই।

এ উদ্দেশ্যে সর্ব প্রথম আল্লাহ তা'আলার গুণাবলী বর্ণনা করা হয়েছে যাতে শ্রোতারা ভালভাবে উপলবদ্ধি করতে পারে যে, কোন মহান সত্তার পক্ষ থেকে তাঁকে সম্বোধন করা হচ্ছে। তারপর নিম্নের বিষয়গুলো ধারাবাহিকভাব পেশ করা হয়েছে।

ঈমানের অনিবার্য দাবী হচ্ছে, ব্যক্তি যেন আল্লাহর পথে অর্থ-সম্পদ ব্যয় করতে গড়িমসি ও টালবাহানা না করে। এ ধরনের কাজ শুধু ঈমানের পরিপন্থীই নয়, বাস্তবতার বিচারেও ভুল। কেননা, এসব অর্থ-সম্পদ মূলত আল্লাহ তা'আলারই অর্থ-সম্পদ। তোমাদেরকে খলিফা হিসেবে তা ব্যবহার করার ইখতিয়ার দেয়া হয়েছে। এ অর্থ-সম্পদই কাল অন্যদের হাতে ছিল, আজ তোমাদের হাতে আছে এবং ভবিষ্যতে অন্য কারো হাতে চলে যাবে। শেষ মেশ তা বিশ্ব-জাহানের প্রতিটি জিনিসের মালিক আল্লাহর কাছেই থেকে যাবে। এ সম্পদের কোন অংশ তোমাদের কাজে লাগলে কেবল সেই অংশই লাগতে পারে যা তোমাদের অধিকারে থাকা কালে তোমরা আল্লাহর কাজে ব্যয় করবে।

আল্লাহর পথে জান ও মালের কুরবানী পেশ করা যদিও সর্বাবস্থায়ই সম্মানজনক কাজ। কিন্তু এসব ত্যাগ ও কুরবানীর মূল্য ও মর্যাদা অবস্থার নাজুকতা দিয়ে নিরূপিত হয়। এমন সময়ও আসে যখন কুফরী শক্তি অত্যন্ত প্রবল হয়ে ওঠে এবং সর্বক্ষণ এমন একটা আশংকা বিদ্যমান থাকে যে, কুফরীর সাথে সংঘাতে ইসলাম হয়তো পরাভূত হয়ে পড়বে। আবার এমন একটা সময়ও আসে যখন কুফর ও ইসলামের দ্বন্দে শক্তির ভারসাম্য ইসলামের দিকে ঝুঁকে পড়ে এবং ন্যায় ও সত্যের দুশমনের মোকাবেলায় ঈমানের অনুসারীরা বিজয়লাভ করতে থাকে। গুরুত্বের দিক দিয়ে এ দু'টি পরিস্থিতি সমান নয়। তাই এ ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতিতে যে ত্যাগ ও কুরবানী পেশ করা হয় মূল্যের দিক দিয়ে তাও সমান নয়। ইসলাম যখন দুর্বল তখন তাকে সমুন্নত ও বিজয়ী করার জন্য যারা প্রাণপণ চেষ্টা সাধনা ও অর্থ সম্পদ অকাতরে ব্যয় করবে তারা তাদের সমমর্যাদা লাভ করতে পারবে না।

ন্যায় ও সত্যের পথে যতটা সম্পদ ব্যয় করা হবে আল্লাহর কাছে তা ঋণ হিসেবে গণ্য হবে। আর আল্লাহ ঐ সম্পদকে কয়েকগুণ বৃদ্ধি করে ফেরত দেবেন শুধু তাই নয় নিজের পক্ষ থেকে অতিরিক্ত পুরস্কারও দান করবেন।

আখেরাতে সেসব ঈমানদার কেবল নূর লাভ করবে যারা আল্লাহর পথে তাদের অর্থ-সম্পদ ব্যয় করেছে। মুনাফিকরা যারা দুনিয়াতে নিজেদের স্বার্থই কেবল রক্ষা করেছে এবং ন্যায় ও সত্য বিজয়ী হচ্ছে, না বাতিল বিজয়ী হচ্ছে তার কোন পরোয়াই করেনি। দুনিয়ার এ জীবনে তারা ঈমানদারদের সাথেই মিলে মিশে থাকলেও আখেরাতে তাদেরকে ঈমানদারদের থেকে আলাদা করে দেয়া হবে। তারা 'নূর' থেকে বঞ্চিত হবে এবং কাফেরদের সাথে তাদের হাশর হবে।

যেসব আহলে কিতাবের গোটা জীবন দুনিয়া পূজায় অতিবাহিত হয়েছে এবং যাদের মন দীর্ঘদিনের গাফলতি ও অমনোযোগিতার কারণে পাথরের ন্যায় কঠোর হয়ে গিয়েছে মুসলমানদের তাদের মত হয়ে যাওয়া ঠিক নয়। সে কেমন ঈমানদার আল্লাহর কথা শুনে যার হৃদয়-মন বিগলিত হয় না এবং তাঁর নাযিলকৃত সত্য বিধানের সামনে মাথা নত করে না।

কেবল সেই সব ঈমানদারই আল্লাহর নিকট 'সিদ্দিক' ও শহীদ বলে গণ্য যারা কোন রকম প্রদর্শনীর মনোভাব ছাড়াই একান্ত আন্তরিকতা ও সততার সাথে নিজেদের অর্থ-সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করে।

দুনিয়ার জীবন মাত্র কয়েক দিনের চাকচিক্য এবং ধোকার উপকরণ। এখানকার খেল তামাসা, এখানকার আনন্দ ও আকর্ষণ, এখানকার সৌন্দর্য ও সাজ-সজ্জা, এখানকার শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে গর্ব ও অহংকার এবং এখানকার ধন-সম্পদ ও ঐশ্বর্যের ব্যাপারে একে অপরকে অতিক্রম করার চেষ্টা সাধনা সব কিছুই অস্থায়ী। এর উপমা দেয়া যায়

সেই শস্য ক্ষেত্রের সাথে যা প্রথম পর্যায়ে সবুজ ও সতেজ হয়ে ওঠে। তারপর বিবর্ণ হয়ে তামাটে বর্ণ ধারণ করে এবং সর্বশেষ ভূষিতে পরিণত হয়। প্রকৃতপক্ষে আখেরাতের জীবন হচ্ছে স্থায়ী জীবন যেখানে সব কাজের বড় বড় ফলাফল পাওয়া যাবে। তোমাদের যদি প্রতিযোগিতামূলকভাবে কিছু করতে হয় তাহলে জান্নাতের দিকে দ্রুত অগ্রসর হওয়ার জন্য চেষ্টা করো। পৃথিবীতে আরাম-আয়েশ ও বিপদ-আপদ যাই আসে তা আল্লাহ তা'আলার পূর্ব লিখিত সিদ্ধান্ত অনুসারেই আসে। একজন ঈমানদারের ভূমিকা হওয়া উচিত বিপদ-আপদ আসলে সাহস না হারানো এবং আরাম-আয়েশ ও সুখ-শান্তি আসলে গর্ব প্রকাশ না করা। একজন মুনাফিক বা কাফেরের আচরণ হচ্ছে আল্লাহ যদি তাকে নিয়ামত দান করেন তাহলে সে গর্বে মেতে উঠে, অহংকার প্রকাশ করতে থাকে এবং নিয়ামত দাতা আল্লাহর কাজে ব্যয় করতে নিজেও সংকীর্ণতার পরিচয় দেয় এবং অন্যদেরকেও কার্পণ্য করতে পরামর্শ দেয়।

আল্লাহ সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ, কিতাব এবং ন্যায় বিচারের ভারসাম্যপূর্ণ মানদণ্ড সহকারে তাঁর রসূল পাঠিয়েছেন, যাতে মানুষ ইনসাফের ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে আর তার সাথে লোহাও নাযিল করেছেন যাতে ন্যায় ও সত্য প্রতিষ্ঠা এবং বাতিলের মাথা অবনত করার জন্য শক্তি ব্যবহার করা যায়। এভাবে আল্লাহ দেখতে চান মানুষের মধ্যে এমন লোক কারা যারা তাঁর দ্বীনের সহায়তা ও সাহায্যের জন্য প্রস্তুত হয় এবং সেজন্য প্রাণপণে চেষ্টা করে। তোমাদের নিজেদের উন্নতি ও মর্যাদার জন্য আল্লাহ এই সুযোগসমূহ সৃষ্টি করেছেন। অন্যথায় আল্লাহ তাঁর কাজের জন্য কারো মুখাপেক্ষী নন।

আল্লাহর পক্ষ থেকে ইতিপূর্বেও একের পর এক নবী-রসূলগণ এসেছেন। তাদের আহবানে কিছু লোক সঠিক পথে ফিরে এসেছে। কিন্তু অধিকাংশ লোকই পাপাচারী রয়ে গিয়েছে। তারপর ঈসা আলাইহিস সালাম এসেছেন। তাঁর শিক্ষায় মানুষের মধ্যে বহু নৈতিক গুণাবলী সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু তাঁর 'উম্মাত' বৈরাগ্যবাদের বিদআত অবলম্বন করে।

এখন আল্লাহ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পাঠিয়েছেন। যারা তাঁর প্রতি ঈমান আনবে এবং আল্লাহকে ভয় করে জীবন যাপন করবে আল্লাহ তাদেরকে তাঁর রহমতের দ্বিগুণ অংশ দেবেন এবং তাদেরকে এমন 'নূর' দান করবেন যার সাহায্যে তারা দুনিয়ার জীবনে পদে পদে বাঁকা পথসমূহের মধ্যে সোজা পথটি স্পষ্ট দেখে চলতে পারবে। আহলে কিতাব নিজেদেরকে যদিও আল্লাহর রহমতের ঠিকাদার মনে করে থাকে। কিন্তু আল্লাহর রহমত তাঁর নিজেরই হাত আছে। যাকে ইচ্ছা তাকে এই রহমত ও অনুগ্রহ দান করার ইখতিয়ার তাঁর আছে। এ হচ্ছে এই সূরায় সুবিন্যস্ত ও ধারাবাহিকভাবে বর্ণিত বিষয়বস্তুর সার সংক্ষেপ।

খালিদ ইবনু মা'দান হতে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি ঘুমের পূর্বে 'মুসাব্বিহাত' (যে সকল সূরা শুরু 'সাব্বাহা বা ইউসাব্বিহু' দিয়ে) পাঠ করতেন এবং তিনি বলতেন: "এগুলোর মধ্যে এমন একটি আয়াত রয়েছে, যা এক হাজার আয়াতের সমান।" [সুনান আদ-দারেমী ৩৪৬৩]

ইবনু কাসীর (রহঃ) বলেছেন : এ হাদীসে যে আয়াতের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে (আল্লাহ তা 'আলাই ভাল জানেন) তা হল : (هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَیْءٍ عَلِیْمٌ)

"তিনিই আদি, তিনিই অন্ত, তিনিই জাহের, তিনিই বাতেন এবং তিনি সর্ববিষয়ে অধিক অবহিত।"

নাসাঈ বলেন, 'মু'আবিয়া বলেন: কোন কোন আহলে ইলম ছয়টি সুরাহকে মুসাব্বিহাত গণ্য করতেন: সুরাহ হাদীদ, হাশর, ওয়াল হাওয়ারিঈন (আস সফ); সুরাহ জুমু'আ, তাগাবুন এবং সুরা আ'লা।

পূর্ববর্তী ও পরের সূরার সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী সূরার (সূরা ওয়াকিয়াহ) শেষে আখিরাতের আলোচনা ছিল। আর এ সূরা শুরু করা হয়েছে তাওহীদের কথা দিয়ে তাওহীদের প্রতি ঈমানের উপরই আখিরাতের সাফল্য নির্ভরশীল, তাই দু'টি বিষয়ের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর। উভয় সূরার সম্পর্ককে এভাবেও বর্ণনা করা যায় যে- পূর্ববর্তী সূরার শেষ কথা ছিল, "হে রাসূল ! আপনি আপনার প্রতিপালক আল্লাহ পাকের পবিত্র নামের তাসবীহ পাঠ করুন" ! আর এ সূরার শুরুতেই ঘোষণা করা হয়েছে, "আসমান জমিনের সবকিছু আল্লাহ পাকের তাসবীহ পাঠে রত রয়েছে।"

এ সূরায় (সূরা হাদীদ) মানবজাতির হেদায়েতের জন্য যুগে যুগে নবী রাসূল প্রেরণের উল্লেখ রয়েছে। আর পরের সূরা মুজাদালাহ এ বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে, যে আল্লাহ তা'আলা নবী (সাঃ) -এর মাধ্যমে এমন হেদায়েতনামা প্রেরণ করেন যার দ্বারা মানব জীবনের কঠিন ও জটিল সমস্যার সমাধান হয় এবং শরিয়তের বিধান প্রবর্তনের মাধ্যমে মানুষের দুঃখ-কষ্ট দূর করা হয়।

سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرۡضِ ۚ وَ هُوَ الۡعَزِیۡزُ الۡحَکِیۡمُ

১. আসমানসমূহ ও যমীনে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। আর তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

বিশ্ব-জাহানের প্রত্যেকটি বস্তু সদা সর্বদা এ সত্য প্রকাশ এবং ঘোষণা করে চলেছে যে, এ বিশ্ব-জাহানের স্রষ্টা ও পালনকর্তা সব রকম দোষ-ত্রুটি, অপূর্ণতা, দুর্বলতা, ভুল ভ্রান্তি ও অকল্যাণ থেকে পবিত্র। তাঁর ব্যক্তি সত্তা পবিত্র, তাঁর গুণাবলী পবিত্র, তাঁর কাজকর্ম পবিত্র এবং তাঁর সমস্ত সৃষ্টিমূলক বা শরীয়াতের বিধান সম্পর্কিত নির্দেশাবলীও পবিত্র। [কুরতুবী; সা'দী]

আয়াতে وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ বলা হয়েছে। عَزِيز শব্দের অর্থ পরাক্রমশালী, শক্তিমান ও অপ্রতিরোধ ক্ষমতার অধিকারী, যাঁর সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন পৃথিবীর কোন শক্তিই রোধ করতে পারে না, ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় যাঁর আনুগত্য সবাইকে করতে হয়, যাঁর অমান্যকারী কোনভাবেই তাঁর পাকড়াও থেকে রক্ষা পায় না। আর حَكِيم শব্দের অর্থ হচ্ছে, তিনি যা-ই করেন, জ্ঞান ও যুক্তি বুদ্ধির সাহায্যে করেন। তাঁর সৃষ্টি, তাঁর ব্যবস্থাপনা, তার শাসন, তার আদেশ নিষেধ, তার নির্দেশনা সব কিছুই জ্ঞান ও যুক্তি নির্ভর। তাঁর কোন কাজেই অজ্ঞতা, বোকামি ও মূর্খতার লেশমাত্র নেই।

لَهٗ مُلۡکُ السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرۡضِ ۚ یُحۡیٖ وَ یُمِیۡتُ ۚ وَ هُوَ عَلٰی کُلِّ شَیۡءٍ قَدِیۡرٌ

২. আসমানসমূহ ও যমীনের সর্বময় কর্তৃত্ব তাঁরই; তিনি জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান; আর তিনিই সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান।

তাই তিনি যেভাবে চান এগুলোর মধ্যে কর্তৃত্ব চালান। তিনি ব্যতীত এগুলোতে অন্য কারো নির্দেশ ও কর্তৃত্ব চলে না। অথবা অর্থ হল, বৃষ্টি, উদ্ভিদ ও রুযীর সমস্ত ভান্ডার তাঁরই মালিকানাধীন।

هُوَ الۡاَوَّلُ وَ الۡاٰخِرُ وَ الظَّاهِرُ وَ الۡبَاطِنُ ۚ وَ هُوَ بِکُلِّ شَیۡءٍ عَلِیۡمٌ

৩. তিনিই প্রথম ও শেষ; প্রকাশ্য (উপরে) ও গোপন (নিকটে) আর তিনি সবকিছু সম্পর্কে সম্যক অবগত।

ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেনঃ কোন সময় তোমার অন্তরে আল্লাহ তাআলা ও ইসলাম সম্পর্কে শয়তানী কুমন্ত্রণা দেখা দিলে (هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) আয়াতখানি আস্তে পাঠ করে নাও। [আবু দাউদ: ৫১১০] এই আয়াতের তাফসীর এবং "আউয়াল", "আখের", "যাহের" ও "বাতেন" এ শব্দ চারটির অর্থ সম্পর্কে তফসীরবিদগণের বহু উক্তি বর্ণিত আছে। তন্মধ্যে "আউয়াল" শব্দের অর্থ তো প্রায় নির্দিষ্ট; অর্থাৎ অস্তিত্বের দিক দিয়ে সকল সৃষ্টজগতের অগ্রে ও আদি। কারণ, তিনি ব্যতীত সবকিছু তাঁরই সৃজিত। তাই তিনি সবার আদি। "আখের" এর অর্থ কারও কারও মতে এই যে, সবকিছু বিলীন হয়ে যাওয়ার পরও তিনি বিদ্যমান থাকবেন। [সা'দী] যেমন (كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ) [সূরা আল-কাসাস: ৮৮] আয়াতে এর পরিষ্কার উল্লেখ আছে।

ইমাম বুখারী বলেন, 'যাহের' অর্থ জ্ঞানে তিনি সবকিছুর উপর, অনুরূপ তিনি 'বাতেন' অর্থাৎ জ্ঞানে সবকিছুর নিকটে। বিভিন্ন হাদীসে এ আয়াতের তাফসীর এসেছে, এক হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘুমানোর সময় বলতেন, "হে আল্লাহ! সাত আসমানের রব, মহান আরশের রব, আমাদের রব এবং সবকিছুর রব, তাওরাত, ইঞ্জীল ও ফুরকান নাযিলকারী, দানা ও আঁটি চিরে বৃক্ষের উদ্ভাবকারী, আপনি ব্যতীত কোন হক্ক মা'বুদ নেই, যাদের কপাল আপনার নিয়ন্ত্রণে এমন প্রত্যেক বস্তুর অনিষ্ট হতে আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি, আপনি অনাদি, আপনার আগে কিছু নেই, আপনি অনন্ত আপনার পরে কিছুই থাকবে না। আপনি সবকিছুর উপরে, আপনার উপরে কিছুই নেই, আপনি নিকটবর্তী, আপনার চেয়ে নিকটবর্তী কেউ নেই, আমার পক্ষ থেকে আপনি আমার ঋণ পরিশোধ করে দিন এবং আমাকে দারিদ্রতা থেকে মুক্তি দিন। [মুসলিম: ২৭১৩, মুসনাদে আহমাদ ২/৪০৪]

هُوَ الَّذِیۡ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرۡضَ فِیۡ سِتَّۃِ اَیَّامٍ ثُمَّ اسۡتَوٰی عَلَی الۡعَرۡشِ ؕ یَعۡلَمُ مَا یَلِجُ فِی الۡاَرۡضِ وَ مَا یَخۡرُجُ مِنۡہَا وَ مَا یَنۡزِلُ مِنَ السَّمَآءِ وَ مَا یَعۡرُجُ فِیۡہَا ؕ وَ ہُوَ مَعَکُمۡ اَیۡنَ مَا کُنۡتُمۡ ؕ وَ اللّٰہُ بِمَا تَعۡمَلُوۡنَ بَصِیۡرٌ

৪. তিনি ছয় দিনে আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করেছেন; তারপর তিনি আরশের উপর উঠেছেন। তিনি জানেন যা কিছু যমীনে প্রবেশ করে এবং যা কিছু তা থেকে বের হয়, আর আসমান থেকে যা কিছু অবতীর্ণ হয় এবং তাতে যা কিছু উত্থিত হয়। আর তোমরা যেখানেই থাক না কেন— তিনি তোমাদের সঙ্গে আছেন, আর তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ্ তার সম্যক দ্রষ্টা।

এখানে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সৃষ্টি ছয় দিনে সমাপ্ত হওয়ার কথা বলা হয়েছে। এর ব্যাখ্যা দিয়ে সূরা ফুসসিলাতের নবম ও দশম আয়াতে বলা হয়েছে যে, দুদিনে ভূমণ্ডল, দুদিনে ভূমণ্ডলের পাহাড়, সমুদ্র, খনি, বৃক্ষ, উদ্ভিদ এবং মানুষ ও জন্তুজানোয়ারের পানাহারের বস্তু-সামগ্রী সৃষ্টি করা হয়েছে। মোট চার দিন হল। বলা হয়েছেঃ (خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ) আবার বলা হয়েছে (وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ) যে দুদিনে ভূমণ্ডল সৃষ্টি করা হয়েছে, তা ছিল রবিবার ও সোমবার। দ্বিতীয় দুদিন ছিল মঙ্গল ও বুধ, যাতে ভূমণ্ডলের সাজ-সরঞ্জাম পাহাড়, নদী ইত্যাদি সৃষ্টি করা হয়। এরপর বলা হয়েছেঃ (فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ) অর্থাৎ "অতঃপর সাত আকাশ সৃষ্টি করেন দুদিনে [সূরা ফুসসিলাতঃ ১২ বাহ্যতঃ এ দুদিন হবে বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার; অর্থাৎ এ পর্যন্ত ছয় দিন হল।

জানা কথা যে, সূর্যের পরিক্রমণের ফলে দিন ও রাত্রির সৃষ্টি। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টির পূর্বে যখন চন্দ্র-সূর্যই ছিল না, তখন ছয় দিনের সংখ্যা কি হিসাবে নিরূপিত হল? কোন কোন তাফসীরবিদ বলেছেনঃ ছয় দিন বলে জাগতিক ৬ দিন বুঝানো হয়েছে। কিন্তু পরিস্কার ও নির্মল উত্তর এই যে, সূর্যোদয় থেকে সূর্যস্ত পর্যন্ত যে দিন

এবং সূর্যস্ত থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত যে রাত এটা এ জগতের পরিভাষা। বিশ্ব সৃষ্টির পূর্বে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে দিবা-রাত্রির পরিচয়ের অন্য কোন লক্ষণ নির্দিষ্ট থাকতে পারে; যেমন জান্নাতের দিবা-রাত্রি সূর্যের পরিক্রমণের অনুগামী হবেনা। সহীহ বর্ণনা অনুযায়ী যে ছয় দিনে জগত সৃষ্টি হয়েছে তা রবিবার থেকে শুরু করে শুক্রবার শেষ হয়।

এখানে প্রশ্ন হয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা সমগ্র বিশ্বকে মুহুর্তের মধ্যে সৃষ্টি করতে সক্ষম। স্বয়ং কুরআনুল কারীমেও বিভিন্ন ভঙ্গিতে একথা বার বার বলা হয়েছে। কোথাও বলা হয়েছেঃ "এক নিমেষের মধ্যে আমার আদেশ কার্যকরী হয়ে যায়।" [সূরা আল-কামারঃ ৫০] আবার কোথাও বলা হয়েছেঃ "আল্লাহ তা'আলা যখন কোন বস্তু সৃষ্টি করতে চান, তখন বলে দেনঃ হয়ে যাও।" আর সঙ্গে সঙ্গে তা সৃষ্টি হয়ে যায়।" [যেমন, সূরা আল-বাকারাহঃ ১১৭] এমতাবস্থায় বিশ্ব সৃষ্টিতে ছয় দিন লাগার কারণ কি? তাফসীরবিদ সায়ীদ ইবন জুবাইর রাহিমাহুল্লাহ এ প্রশ্নের উত্তরে বলেনঃ আল্লাহ তা'আলার মহাশক্তি নিঃসন্দেহে এক নিমেষে সব কিছু সৃষ্টি করতে পারে, কিন্তু মানুষকে বিশ্ব ব্যবস্থা পরিচালনার ধারাবাহিকতা ও কর্মতৎপরতা শিক্ষা দেয়ার উদ্দেশ্যেই এতে ছয় দিন ব্যয় করা হয়েছে। [তাফসীরে জাকারিয়া]

'অতঃপর তিনি আরশের ওপর সমুন্নত হলেন।' আল্লাহ তা'আলার অবস্থান সম্পর্কে এরূপ আরও ৭টি আয়াত রয়েছে। সূরা ইউনুস ৩, সূরা রাদ ২, ত্বা-হা- ৫, ফুরকান ৫৯, সিজদাহর ৪-৫ এবং হাদীদের ৪ নং আয়াতে উল্লেখ রয়েছে। এ সাতটি আয়াতেই الْعَرْشُ 'আরশ' শব্দের পরে عَلَي বা উপরে অব্যয়টি ব্যবহার করা হয়েছে যার অর্থ হল আরশের ওপর।

আল্লাহ তা'আলা আরশের ওপর রয়েছেন- এ ব্যাপারে অনেক সহীহ হাদীস রয়েছে। তার মধ্যে অন্যতম হল: সাহাবী মু'আবিয়াহ বিন হাকাম আস সুলামী (রাঃ) যখন রাসূল (সাঃ) এর কাছে তাঁর দাসীকে আযাদ করার ইচ্ছা ব্যক্ত করলেন তখন রাসূল (সাঃ) বললেন, তাকে আমার কাছে নিয়ে এসো। মু'আবিয়াহ বিন হাকাম (রাঃ) বলছেন; আমি সেই দাসীকে নিয়ে আসলাম। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সেই দাসীটিকে লক্ষ করে বললেন: আল্লাহ তা'আলা কোথায়? দাসী বলল: আকাশের উপর। তিনি (সাঃ) আবার বললেন: আমি কে? দাসী বলল: আপনি আল্লাহর রাসূল। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন: তাকে আযাদ করে দাও, সে মু'মিনা নারী। (সহীহ মুসলিম হা: ২২২৭)

এ সকল আয়াত ও হাদীসের আলোকে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের এটাই আকীদাহ, আল্লাহ তা'আলা স্বস্বত্ত্বায় আরশের ওপর আছেন; সেখান থেকে তিনি সবকিছু দেখছেন, শুনছেন, জানছেন। তিনি সর্বত্র বিরাজমান নন। তিনি তাঁর শ্রবণ, দর্শন ও জ্ঞানের দিক দিয়ে আমাদের সাথে রয়েছেন। কিন্তু আরশের ওপর কিভাবে আছেন তা আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল (সাঃ) আমাদের জানাননি; তাই আমরা জানি না। এ সম্পর্কে প্রশ্ন করা নিষেধ। ইমাম মালিক (রহঃ)-কে যখন জিজ্ঞাসা করা হল, আল্লাহ তা'আলা আরশে কিভাবে আছেন? তিনি জবাবে বললেন: আল্লাহ তা'আলা আরশের উপরে আছেন তা জানা কথা। কিন্তু কিভাবে আছেন তা অজ্ঞাত, এ ব্যাপারে ঈমান রাখা ওয়াজিব এবং প্রশ্ন করা বিদআত।

আল্লাহ তা'আলা আরশের ওপর রয়েছেন- এ কথা যারা মানতে পারে না তারা বিভিন্ন যুক্তি-প্রমাণ পেশ করে থাকে। সালাফগণ তাদের যথার্থ উত্তর দিয়ে আল্লাহ তা'আলার আরশের ওপর অবস্থান সম্পর্কে কুরআন ও সুন্নাহ যেভাবে সংবাদ দিয়েছে সেভাবে প্রমাণিত করেছেন। আল্লাহ তা'আলার আরশের হাকীকত ও ধরন তিনি ছাড়া কেউ জানে না। [ফাতহুল মাজীদ]

আল্লাহ্ শুধু সামগ্রিক জ্ঞানের অধিকারী নন, খুঁটি নাটি বিষয়েও জ্ঞানের অধিকারী। এক একটি শস্যদানা ও বীজ যা মাটির গভীরে প্রবিষ্ট হয়, এক একটি ছোট পাতা ও অঙ্কুর যা মাটি ফুঁড়ে বের হয়, বৃষ্টির এক একটি বিন্দু যা আসমান থেকে পতিত হয় এবং সমুদ্র ও খালবিল থেকে যে বাষ্পরাশি আকাশের দিকে উত্থিত হয়, তার প্রতিটি মাত্রা তাঁর জানা আছে। কোন্ দানাটি ও বীজটি পৃথিবীর কোন্খানে কিভাবে পড়ে আছে তা তিনি জানেন বলেই সেটিকে বিদীর্ণ করে অঙ্কুরোদগম করেন এবং তাকে লালন পালন করে বড় করেন। কি পরিমাণ বাষ্প কোন্ কোন্ স্থান থেকে উত্থিত হয়েছে এবং কোথায় কোথায় পৌঁছেছে তা তিনি জানেন বলেই সেগুলো একত্রিত করে মেঘমালা সৃষ্টি করেন এবং ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন অংশের জন্য তা বণ্টন করে দিয়ে একটি হিসেব অনুসারে বৃষ্টিপাত ঘটান। আর যেসব জিনিস মাটিতে প্রবেশ করে ও তা থেকে বেরিয়ে আসে এবং যেসব জিনিস আসমানের দিকে উঠে যায় ও তা থেকে নেমে আসে তাঁর বিস্তারিত দিকও এর আলোকে অনুমান ও অনুধাবন করা যেতে পারে। আল্লাহর জ্ঞান যদি এসব বিষয়ে পরিব্যপ্ত না হতো, তাহলে প্রতিটি জিনিসই আলাদা আলাদা ব্যবস্থাপনা এবং প্রত্যেকটি জিনিসই এমন নিপুন, নিখুঁত ও বিজ্ঞোচিত পন্থায় ব্যবস্থাপনা করা কিভাবে সম্ভব হতো? [তাফহীমুল কুরআন]

لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ؕ وَ اِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ

৫. আসমানসমূহ ও যমীনের সর্বময় কর্তৃত্ব তাঁরই এবং আল্লাহরই দিকে সব বিষয় প্রত্যাবর্তিত হবে।

আকাশ ও পৃথিবীর সমুদয় জিনিসের উপর মালিকানা রয়েছে একমাত্র তাঁরই। সারা আসমান ও যমীনের সৃষ্টজীব তাঁরই দাসত্বের শৃংখলে আবদ্ধ, তাঁরই খাদেম এবং তাঁর সামনে অবনত। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ "আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে এমন কেউ নেই, যে দয়াময়ের নিকট উপস্থিত হবে না বান্দারূপে। তিনি তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রেখেছেন এবং তিনি তাদেরকে বিশেষভাবে গণনা করেছেন, আর কিয়ামত দিবসে তাদের সকলেই তাঁর নিকট আসবে একাকী অবস্থায়।" (১৯:৯৩-৯৫)

মহান আল্লাহর উক্তিঃ "আল্লাহরই দিকে সমস্ত বিষয় প্রত্যাবর্তিত হবে।' তিনি তাঁর মাখলুকের মধ্যে যা চান হুকুম দিয়ে থাকেন। তিনি ন্যায় বিচারক, তিনি অবিচার ও যুলুম করেন না। বরং এক একটি পুণ্যকে তিনি দশগুণ করে বাড়িয়ে দেন এবং নিজের পক্ষ হতে বড় প্রতিদান প্রদান করে থাকেন। যেমন তিনি বলেনঃ"কিয়ামতের দিন আমি ন্যায়ের মানমণ্ড স্থাপন করবে, তখন কোন নফসের প্রতি বিন্দুমাত্র যুলুম করা হবে না, কোন কিছু যদি সরিষার দানা পরিমাণও হয় তবুও তা আমি হাযির করবে এবং হিসাব গ্রহণের জন্যে আল্লাহই যথেষ্ট।" (২১:৪৭)।

يُوْلِجُ الَّيْلَ فِى النَّهَارِ وَ يُوْلِجُ النَّهَارَ فِى الَّيْلِ ؕ وَ هُوَ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ

৬. তিনিই রাতকে প্রবেশ করান দিনে আর দিনকে প্রবেশ করান রাতে এবং তিনি অন্তরের বিষয়াদি সম্পর্কে সম্যক অবগত।

অর্থাৎ মাখলুকের মধ্যে সবকিছুর ব্যবস্থাপনা তিনিই করেন। দিবস ও রজনীর পরিবর্তন ঘটানো তাঁরই কাজ। স্বীয় হিকমতের মাধ্যমে তিনি এ দু'টির হ্রাস-বৃদ্ধি করে থাকেন। কখনো দিন বড় করেন ও রাত্রি ছোট করেন এবং কখনো রাত্রি বড় করেন ও দিন ছোট করেন। আবার কখনো দুটোকেই সমান করে দেন। কখনো করেন শীতকাল, কখনো করেন গ্রীষ্মকাল এবং কখনো করেন বর্ষাকাল, কখনো বসন্তকাল, আর কখনো। শরকাল। এ

সব কিছুই বান্দাদের কল্যাণ ও মঙ্গলের জন্যেই করে থাকেন। তিনি অন্তর্যামী। তিনি অন্তরের ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্রতম বিষয়েরও খবর রাখেন। কোন কিছুই তাঁর কাছে গোপন থাকে না।

اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ وَ اَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلَفِيْنَ فِيْهِ ؕ فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَ اَنْفَقُوْا لَهُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ

৭. তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আন এবং আল্লাহ তোমাদেরকে যা কিছুর উত্তরাধিকারী করেছেন তা হতে ব্যয় কর। অতঃপর তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও ব্যয় করে, তাদের জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার।

আয়াতটি অমুসলিমদের সম্বোধন করে একথা বলা হয়নি। বরং পরবর্তী গোটা বক্তব্য থেকে একথাই প্রকাশ পাচ্ছে যে, এখানে সেই সব মুসলমানদের সম্বোধন করা হয়েছে যারা ইসলামের বাণী স্বীকার করে ঈমান গ্রহণকারীদের সাথে শামিল হয়েছিলেন। কিন্তু ঈমানের দাবী পূরণ করা এবং মু'মিনের মত জীবন পদ্ধতি গ্রহণ করা থেকে পাশ কাটিয়ে যাচ্ছিলেন। একথা সবারই জানা যে, অমুসলিমদেরকে ঈমানের দাওয়াত দেয়ার সাথে সাথেই একথা বলা যায় না, যে আল্লাহর পথে জিহাদের খাতে উদার মনে সাহায্য করো। কিংবা তাদেরকে একথাও বলা না যে, তোমাদের মধ্যে যারা বিজয় লাভের পূর্বে জিহাদ ও আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয় করবে তাদের মর্যাদা যারা বিজয় লাভের পরে এসে কাজ করবে তাদের চেয়ে অনেক বেশী হবে। অমুসলিমদের দাওয়াত দেয়ার ক্ষেত্রে প্রথমে তাদের সামনে ইসলামের প্রাথমিক দাবী পেশ করা হয়ে থাকে, চূড়ান্ত দাবী নয়। এ কারণে বক্তব্যের ধারা অনুসারে এখানে اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ বলার অর্থ হচ্ছে, যে সেই সব লোক, যারা ঈমানের দাবী করে মুসলমানদের দলে শামিল হয়েছো---আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে সরল মনে সত্যিকার অর্থে মেনে নাও এবং এমন কর্মপন্থা গ্রহণ করো যা নিষ্ঠাবান মু'মিনদের করা উচিত।

এখানে ব্যয় করার অর্থ সাধারণ কল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করা নয়। বরং ১০ নম্বর আয়াতের ভাষা স্পষ্টভাবে বলছে যে, এখানে এর অর্থ ঐ সময় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নেতৃত্বে কুফরী শক্তির বিরুদ্ধে ইসলামকে সমুন্নত করার যে সংগ্রাম চলছিলো সে উদ্দেশ্যে ব্যয় করা। বিশেষ করে সে সময় এমন দু'টি প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল যেজন্য ইসলামী সরকার চরমভাবে আর্থিক সাহায্যের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়েছিল। এর একটি ছিল সামরিক প্রয়োজন। আর অপরটি ছিল সেসব নির্যাতিত মুসলমানদের সাহায্য সহযোগিতা করা যারা কাফেরদের জুলুম নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে আরবের প্রতিটি অংশ থেকে হিজরত করে মদিনায় চলে এসেছিলো এবং আরো আসছিলো। এ ব্যয় মেটানোর জন্য সত্যিকার ম'মিনগণ তাঁদের শক্তি ও সামর্থের চেয়ে বেশী বোঝা নিজেরা বহন করেছিল। পরবর্তী ১০, ১২, ১৮ ও ১৯ আয়াতে এজন্য তাদের প্রশংসা করা হয়েছে। কিন্তু মুসলমানদের মধ্যে বহুসংখ্যক এমন স্বচ্ছল লোকও ছিল যারা কুফর ও ইসলামের এ সংঘাতকে নিছক দর্শক হয়ে দেখছিলো। যে জিনিসের প্রতি ঈমান পোষণের দাবী তারা করছিলো তার কিছু কর্তব্য ও দায়-দায়িত্ব যে তাদের প্রাণ ও সম্পদের ওপর বর্তায়, সে বিষয়ে কোন অনুভূতিই তাদের ছিল না। এ দ্বিতীয় প্রকারের লোকদেরকেই এ আয়াতে সম্বোধন করা হয়েছে। তাদের বলা হচ্ছে, খাঁটি মু'মিন হও এবং আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয় কর।

তোমাদেরকে যা কিছুর উত্তরাধিকারী করেছেন- এর দু'টি অর্থ এবং দু'টি অর্থই এখানে প্রযোজ্য। একটি অর্থ হচ্ছে, তোমাদের কাছে যে সম্পদ আছে তা মূলত তোমাদের নিজের সম্পদ নয়, তা আল্লাহর দেয়া সম্পদ। তোমরা নিজেরা এর মালিক নও। আল্লাহ তাঁর নিজের প্রতিনিধি হিসেবে এ সম্পদ তোমাদের অধিকারে

দিয়েছেন। অতএব, সম্পদের মূল মালিকের কাজে তা ব্যয় করতে কুণ্ঠিত ও পিছপা হয়ো না। মালিকের সম্পদ মালিকের কাজে ব্যয় করতে টালবাহানা করা প্রতিনিধির কাজ নয়। দ্বিতীয় অর্থ হলো, এ অর্থ চিরদিন তোমাদের কাছে ছিল না এবং চিরদিন তোমাদের কাছে থাকবেও না। কাল তা অন্য কিছু লোকের কাছে ছিল, আজ আল্লাহ তোমাদেরকে তাদের স্থলাভিষিক্ত করে তা তোমাদের হাতে সোপর্দ করেছেন। আবার এমন এক সময় আসবে যখন তা তোমাদের কাছে থাকবে না। অন্য লোকেরা তোমাদের স্থলাভিষিক্ত হবে। সাময়িক কর্তৃত্বের এ সংক্ষিপ্ত সময়ে যখন এ সম্পদ তোমাদের অধিকার ও কর্তৃত্বে থাকে তখন আল্লাহর কাজে তা খরচ করো, যাতে আখেরাতে তোমরা তার স্থায়ী প্রতিদান লাভ করতে পার।

وَ مَا لَكُمۡ لَا تُؤۡمِنُوۡنَ بِاللّٰهِ ۚ وَ الرَّسُوۡلُ يَدۡعُوۡكُمۡ لِتُؤۡمِنُوۡا بِرَبِّكُمۡ وَ قَدۡ اَخَذَ مِيۡثَاقَكُمۡ اِنۡ كُنۡتُمۡ مُّؤۡمِنِيۡنَ

৮. আর তোমাদের কি হল যে, তোমরা আল্লাহর উপর ঈমান আন না? অথচ রাসূল তোমাদেরকে তোমাদের রবের প্রতি ঈমান আনার জন্য ডাকছেন অথচ আল্লাহ তোমাদের কাছ থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন, যদি তোমরা ঈমানদার হও।

কিছু সংখ্যক মুফাস্‌সির এ প্রতিশ্রুতি বলতে অর্থ করেছেন আল্লাহর দাসত্ব করার সে প্রতিশ্রুতি যা সৃষ্টির সূচনা পর্বে আদম আলাইহিস সালামের পৃষ্ঠদেশ থেকে তাঁর সমস্ত সন্তানকে বের করে তাদের সবার নিকট থেকে নেয়া হয়েছিল। কিন্তু অপর কিছু সংখ্যক তাফসীরকারক এর অর্থ করেছেন 'সে প্রতিশ্রুতি যা প্রত্যেক মানুষের প্রকৃতি ও প্রকৃতিগত বিবেক-বুদ্ধিতে আল্লাহর দাসত্বের জন্য বর্তমান। [কুরতুবী] কিন্তু সঠিক কথা হলো, এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যের সচেতন প্রতিশ্রুতি, ঈমান গ্রহণ করার মাধ্যমে প্রত্যেক মুসলিম আল্লাহর সাথে যে প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ হয়। কুরআন মজীদের অন্য এক স্থানে যে ভাষায় এ প্রতিশ্রুতির উল্লেখ করা হয়েছে তা হচ্ছে, "আল্লাহ তোমাদের যেসব নিয়ামত দান করেছেন সেসব নিয়ামতের কথা মনে কর এবং তোমাদের কাছ থেকে যে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছেন তার কথাও মনে কর। সে সময় তোমরা বলেছিলে, আমরা শুনলাম এবং আনুগত্য করলাম। আর আল্লাহকে ভয় কর আল্লাহ মনের কথাও জানেন।" [সূরা আল-মায়েদাহ: ৭]

উবাদা ইবনে সামেত থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের থেকে এই মর্মে বাইয়াত গ্রহণ করেছিলেন যে, আমরা যেন সক্রিয়তা ও নিষ্ক্রিয়তা উভয় অবস্থায় শুনি ও আনুগত্য করে যাই এবং স্বচ্ছলতা ও অস্বচ্ছলতা উভয় অবস্থায় আল্লাহর পথে খরচ করি, ভাল কাজের আদেশ করি এবং মন্দ কাজে নিষেধ করি, আল্লাহ সম্পর্কে সত্য কথা বলি এবং সেজন্য কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারকে ভয় না করি।" [মুসলিম: ১৭০৯, মুসনাদে আহমদ: ৫/৩১৬]।

যদি তোমরা মুমিন হও। এখানে প্রশ্ন হয় যে, এ কথাটি সেই কাফেরদেরকে বলা হয়েছে, যাদেরকে মুমিন না হওয়ার কারণে ইতিপূর্বে (وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ) বলে সতর্ক করা হয়েছে। এমতাবস্থায় 'তাদেরকে তোমরা যদি মুমিন হও' বলা কিরূপে সঙ্গত হতে পারে? জওয়াব এই যে, কাফের ও মুশরিকরাও আল্লাহর প্রতি ঈমানের দাবি করত। প্রতিমাদের ব্যাপারে তাদের বক্তব্য ছিল এই যে, (مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ) "তাদের ইবাদত তো আমরা কেবল এজন্যই করি যে, এরা আমাদেরকে সুপারিশ করে আল্লাহর নৈকট্যের অধিকারী করে দিবে"। [সূরা আয-যুমার: ৩] অতএব, আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহর প্রতি ঈমানের দাবি যদি সত্য হয়, তবে তার বিশুদ্ধ ও ধর্তব্য পথ অবলম্বন কর।

هُوَ الَّذِیۡ یُنَزِّلُ عَلٰی عَبۡدِہٖۤ اٰیٰتٍۭ بَیِّنٰتٍ لِّیُخۡرِجَکُمۡ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَی النُّوۡرِ ؕ وَ اِنَّ اللّٰہَ بِکُمۡ لَرَءُوۡفٌ رَّحِیۡمٌ

৯. তিনিই তাঁর বান্দার প্রতি সুস্পষ্ট আয়াত নাযিল করেন, তোমাদেরকে অন্ধকার হতে আলোতে আনার জন্য। আর নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের প্রতি করুণাময়, পরম দয়ালু।

وَ مَا لَکُمۡ اَلَّا تُنۡفِقُوۡا فِیۡ سَبِیۡلِ اللّٰہِ وَ لِلّٰہِ مِیۡرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرۡضِ ؕ لَا یَسۡتَوِیۡ مِنۡکُمۡ مَّنۡ اَنۡفَقَ مِنۡ قَبۡلِ الۡفَتۡحِ وَ قٰتَلَ ؕ اُولٰٓئِکَ اَعۡظَمُ دَرَجَۃً مِّنَ الَّذِیۡنَ اَنۡفَقُوۡا مِنۡۢ بَعۡدُ وَ قٰتَلُوۡا ؕ وَ کُلًّا وَّعَدَ اللّٰہُ الۡحُسۡنٰی ؕ وَ اللّٰہُ بِمَا تَعۡمَلُوۡنَ خَبِیۡرٌ

১০. আর তোমাদের কি হলো যে, তোমরা আল্লাহর পথে ব্যয় করছ না? অথচ আসমানসমূহ ও যমীনের মীরাস তো আল্লাহরই। তোমাদের মধ্যে যারা বিজয়ের আগে ব্যয় করেছে ও যুদ্ধ করেছে, তারা (এবং পরবর্তীরা) সমান নয়। তারা মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ তাদের চেয়ে যারা পরবর্তী কালে ব্যয় করেছে ও যুদ্ধ করেছে। তবে আল্লাহ্ উভয়ের জন্যই কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আর তোমরা যা করা আল্লাহ্ সে সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত।

ميراث অভিধানে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত মালিকানাকে বলা হয়ে থাকে। এই মালিকানা বাধ্যতামূলক মৃত ব্যক্তি ইচ্ছা করুক বা না করুক, ওয়ারিশ ব্যক্তি আপনাআপনি মালিক হয়ে যায়। এখানে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের উপর আল্লাহ তা'আলার সার্বভৌম মালিকানাকে ميراث শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করার রহস্য এই যে, তোমরা ইচ্ছা কর বা না কর, তোমরা আজ যে যে জিনিসের মালিক বলে গণ্য হও, সেগুলো অবশেষে আল্লাহ তা'আলার বিশেষ মালিকানায় চলে যাবে। [সা'দী, কুরতুবী]

এক হাদীসে এসেছে, আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা বলেন, একদিন আমরা একটি ছাগল যাবাই করে তার অধিকাংশ গোশত বন্টন করে দিলাম, শুধু একটি হাত নিজেদের জন্যে রাখলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে জিজ্ঞাসা করলেনঃ বন্টনের পর এই ছাগলের গোশত কতটুকু রয়ে গেছে? আমি আরয করলামঃ শুধু একটি হাত রয়ে গেছে। তিনি বললেনঃ গোটা ছাগলই রয়ে গেছে। তোমার ধারণা অনুযায়ী কেবল হাতই রয়ে যায়নি। [তিরমিযী: ২৪৭০]

কেননা, গোটা ছাগলই আল্লাহর পথে ব্যয় হয়েছে। এটা আল্লাহর কাছে তোমার জন্যে থেকে যাবে। যে হাতটি নিজের খাওয়ার জন্যে রেখেছ, আখেরাতে এর কোন প্রতিদান পাবে না। কেননা, এটা এখানেই বিলীন হয়ে যাবে। আয়াতের আরেকটি অর্থ হচ্ছে, আল্লাহর পথে অর্থ খরচ করতে গিয়ে তোমাদের কোন রকম দারিদ্র বা অস্বচ্ছলতার আশংকা করা উচিত নয়। কেননা, যে আল্লাহর উদ্দেশ্যে তা খরচ করবে তিনি যমীন ও ঊর্ধ্ব জগতের সমস্ত ভাণ্ডারের মালিক। আজ তিনি তোমাদেরকে যা দান করে রেখেছেন তার কাছে দেয়ার শুধু ঐ টুকুই ছিল না। কাল তিনি তোমাদেরকে তার চেয়েও অনেক বেশী দিতে পারেন। [ইবন কাসীর]

একথাটাই অন্য একটি স্থানে এভাবে বলা হয়েছে, "হে নবী, তাদের বলুন, আমার রব তার বান্দাদের মধ্যে যার জন্য ইচ্ছা অঢেল রিযিক দান করেন এবং যার জন্য ইচ্ছা তা সংকীর্ণ করে দেন। আর তোমরা যা খরচ কর তার পরিবর্তে তিনিই তোমাদেরকে আরও রিযিক দান করেন। তিনি সর্বোত্তম রিযিক দাতা।" [সূরা সাবা: ৩৯]

فَتۡحٌ (বিজয়) থেকে অধিকাংশ মুফাসসির বুঝিয়েছেন মক্কা বিজয়। কারো কারো মতে হুদাইবিয়ার সন্ধিই যেহেতু সুস্পষ্ট বিজয়, তাই এ থেকে হুদাইবিয়ার সন্ধি বুঝিয়েছেন।

আল্লাহর পথে ব্যয় করার প্রতি জোর দেয়ার পর পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহর পথে যা কিছু যে কোন সময় ব্যয় করলে সওয়াব পাওয়া যাবে; কিন্তু ঈমান, আন্তরিকতা ও অগ্রগামিতার পার্থক্যবশত সওয়াবেও পার্থক্য হবে। বলা হয়েছেঃ (لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ) অর্থাৎ যারা আল্লাহর পথে ধনসম্পদ ব্যয় করে তারা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। (এক) যারা মক্কা বিজয়ের পূর্বে বিশ্বাস স্থাপন করত আল্লাহর পথে ব্যয় করেছে। (দুই) যারা মক্কা বিজয়ের পর মুমিন হয়ে আল্লাহর পথে ব্যয় করেছে।

এই দুই শ্রেণীর লোক আল্লাহর কাছে সমান নয়; বরং মর্যাদায় একশ্রেণী অপর শ্রেণী থেকে শ্রেষ্ঠ। মক্কা বিজয়ের পূর্বে বিশ্বাস স্থাপনকারী, জেহাদকারী ও ব্যয়কারীর মর্যাদা অপর শ্রেণী অপেক্ষা বেশী। কারণ, অত্যন্ত কঠিন পরিস্থিতিতে তারা আল্লাহ তা'আলার জন্য এমন সব বিপদাপদের সম্মুখীন হয়েছিলো যার সম্মুখীন অন্য গোষ্ঠীকে হতে হয়নি। মুফাসসিরদের মধ্যে মুজাহিদ, কাতাদা এবং যায়েদ ইবনে আসলাম বলেনঃ এ আয়াতে বিজয় শব্দটি যে ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়েছে সেটি হচ্ছে মক্কা বিজয়। আমের শা'বী বলেনঃ এর দ্বারা হুদায়বিয়ার সন্ধিকে বুঝানো হয়েছে। অধিকাংশ মুফাসসির প্রথম মতটি গ্রহণ করেছেন। [কুরতুবী; ইবন কাসীর]

পারস্পরিক তারতম্য সত্বেও আল্লাহ তা'আলা কল্যাণ অর্থাৎ জান্নাত ও মাগফিরাতের ওয়াদা সবার জন্যেই করেছেন। এই ওয়াদা সাহাবায়ে-কেরামের সেই শ্রেণীদ্বয়ের জন্যে, যারা মক্কাবিজয়ের পূর্বে ও পরে আল্লাহর পথে ব্যয় করেছেন এবং ইসলামের শত্রুদের মোকাবিলা করেছেন। এতে সাহাবায়ে-কেরামের প্রায় সমগ্র দলই শামিল আছে। তাই মাগফিরাত ও রহমতের এই কুরআনী ঘোষণা প্রত্যেক সাহাবীকে শামিল করেছে। [সা'দী] শুধু মাগফিরাতই নয়; (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ) [সূরা আত-তাওবাহঃ ১০০] বলে তাঁর সন্তুষ্টিরও নিশ্চিত আশ্বাস দান করেছেন।

ফূটনোট

⊡ সকল মাখলূক আল্লাহ তা'আলার তাসবীহ ও পবিত্রতা পাঠ করে।

⊡ জীবন ও মৃত্যুর মালিক একমাত্র আল্লাহ তা'আলা।

⊡ যখন কিছু ছিল না তখন আল্লাহ তা'আলা ছিলেন, আর যখন কিছু থাকবে না তখন আল্লাহ তা'আলা থাকবেন।

⊡ আল্লাহ তা'আলা আরশের ওপর থেকেই তাঁর জ্ঞান, দর্শন ও শ্রবণ দ্বারা প্রত্যেকের সাথে রয়েছেন।

⊡ আল্লাহ তা'আলা অন্তরযামী। আকাশ ও জমিনের সার্বভৌমত্বের মালিক একমাত্র আল্লাহ তা'আলা।

⊡ সম্পদকে নেয়ামত মনে করে তার সৎব্যবহার করা উচিত।

⊡ ঈমানের সাথে নেকীর আশায় দান করলে আল্লাহ তা'আলা মহা পুরস্কার প্রদান করবেন।

⊡ الْفَتْحِ বা বিজয় দ্বারা কোন্ বিজয়কে বুঝোনো হয়েছে তা নিয়ে দুটি মত পাওয়া যায়। হুদায়বিয়ার সন্ধি, মক্কা বিজয়।

⊡ সাহাবীদের ব্যাপারে কুটক্তি করা, হিংসা বিদ্বেষ পোষণ করা সে যে কোন সাহাবীর ব্যাপারে হোক না কেন তা হারাম।

⊡ সমস্ত সম্পদের প্রকৃত মালিক একমাত্র আল্লাহ তা'আলা, মানুষকে তা ব্যবহার করার অধিকার দিয়েছেন। আমলের তারতম্য অনুপাতে জান্নাতে মর্যাদার তারতম্য হবে।